দৈনিক সংবাদ

77

তারিখ ... JUL 08 2000

অতিথি কলাম

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও পিটিআই

মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

দীর্ঘদিন থেকেই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর পিটিআইগুলোতে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম এবং দুর্নীতির জন্য, লালন-পালনের পদ্ধতি চালু করে রেখেছে। পিটিআইগুলো জিম্মি হয়ে আছে এ অধিদপ্তরের হাতে। অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ যদিও প্রেষণে আনীত হয়েছেন; কিন্তু তারা এখানে এসে এমনই এক শক্তিশালী চেইন তৈরি করতে সক্ষম হন যে, 'সরকার আসে, সরকার যায়' অথচ প্রেষণে আনীত কর্মকর্তারা স্থায়ী আবাসন গড়ে তুলে ফেলতে সক্ষম হন এবং এর ফলে এ কর্মকর্তারা বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করে 'রাতকে দিন দিনকে রাত' বানিয়ে ফেলছেন। সরকার অধিকাংশ সময়ই অনেক কিছু সম্পর্কে অবহিত থাকেন না।

আমাদের দেশে মোট ৫৩টি প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) রয়েছে। দেশের প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়াই হচ্ছে পিটিআইগুলোর কাজ। সংখ্যায় মাত্র ৫৩টি হলেও এগুলোর ওপর নির্ভর করছে দেশের হাজার হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ এবং ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মান। সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে চলছে দেশের পিটিআইগুলো। এ অধিদপ্তরের সুপারিশক্রমে সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ পিটিআইতে কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকরিবিধি, বেতনবিধিসহ যাবতীয় নিয়মনীতি প্রবর্তন করে থাকে। দীর্ঘদিন থেকেই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর পিটিআইগুলোতে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম এবং দুর্নীতির জন্য, লালন-পালনের পদ্ধতি চালু করে রেখেছে। পিটিআইগুলো জিম্মি হয়ে আছে এ অধিদপ্তরের হাতে। অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ যদিও প্রেষণে আনীত হয়েছেন; কিন্তু তারা এখানে এসে এমনই এক শক্তিশালী চেইন তৈরি করতে সক্ষম হন যে, 'সরকার আসে, সরকার যায়' অথচ প্রেষণে আনীত কর্মকর্তারা স্থায়ী আবাসন গড়ে তুলে ফেলতে সক্ষম হন এবং এর ফলে এ কর্মকর্তারা বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করে 'রাতকে দিন দিনকে রাত' বানিয়ে ফেলছেন। সরকার অধিকাংশ সময়ই অনেক কিছু সম্পর্কে অবহিত থাকেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারের স্বীকৃত নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বিষয়গুলো করে যাচ্ছেন। এ ধরনেরই মারাত্মক কিছু অনিয়মের বিবরণ দিতে চাই এ লেখায়। আশা করছি সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনিয়মগুলো খতিয়ে দেখবে এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা নেবে।

০৬-০১-১৯৯৬ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ থেকে দুটো প্রজ্ঞাপন একই সময় জারি করা হয়েছে। তখন ছিল বিএনপি সরকারের অন্তিম সময়। সম্ভবত সরকারের 'যাই যাই' অবস্থার সুযোগ নিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তারা সরকার প্রধানের স্বাক্ষর এবং রাষ্ট্রপতির অনুমোদন আদায় করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রজ্ঞাপনের স্মারক যথাক্রমে প্রবি/প্রশা-১/১৫(২)/৪১/৯৪/২৪ এবং (দ্বিতীয় পত্র)..../২৫ প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা বরাবরে ইস্যু করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপন ও চিঠির বিষয় হচ্ছে "প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের অধীন প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই)-এর ইনস্ট্রাক্টর পদে তৃতীয় শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণীর (নন-ক্যাডার) পদে উন্নীতকরণ"। পত্রে (নম্বর-২৫) লেখা হয়েছে, "এই আদেশ জারির কারণে পদটির বর্তমান পদধারীগণ উন্নীত পদের সুযোগ-সুবিধা পাইবেন না। উন্নীত পদের মর্যাদা অনুসারে নিয়োগবিধির সংশোধন চূড়ান্ত হওয়ার পরে সংশোধিত বিধির শর্ত পূরণ সাপেক্ষে তাহারা উন্নীত পদের সুযোগ-সুবিধা পাইবেন।" লক্ষ্য করুন, এ আদেশটিতে বেশ কিছু শর্তের কথা বলা হয়েছে, যেগুলো পূরণ করা হলে তবেই উন্নীত পদের সুযোগ-সুবিধাগুলো ইনস্ট্রাক্টরগণ পাবেন। প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এমন একটি প্রথম শ্রেণীর পদে নিয়োগ বিধির অসম্পূর্ণতা থাকবে? আসলে এখানেই নিহিত রয়েছে রহস্যের মূল কারণ। এখন যাদেরকে পিটিআইতে ইনস্ট্রাক্টর বলা হচ্ছে, ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত তাদের পদবি শিক্ষক নামে পরিচিত ছিল। এ শিক্ষকদের একটি অংশ অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ছিল (দেখুন, বিজ্ঞাপন ২ আগস্ট, ১৯৮০, দৈনিক সংবাদ)। আসলে একই পদে বিভিন্ন শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের এ ব্যবস্থা চালুর পর থেকেই সৃষ্টি হয়েছে পদ ও যোগ্যতার মধ্যে বৈষম্য এবং রেষারেষি। তবে এ সমস্যাটি সংকট আকারে রূপান্তরিত হয়েছে ১৯৮৫ সালের নিয়োগবিধি প্রবর্তনের ফলে (বাংলাদেশ গেজেট, ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫)। ওই গেজেটের ৩৫নং ক্রমিকে ইনস্ট্রাক্টর (সাধারণ) পদে পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ৩০% পদোন্নতির ব্যবস্থা রাখা হয়, এদের শিক্ষাগত যোগ্যতা রাখা হয় স্নাতকসহ বিএড, ৩৬ ক্রমিকে ইনস্ট্রাক্টর (বিজ্ঞান) এমএডসহ বি, এসসি, কৃষিতে বিএজি, শরীরচর্চা শিক্ষক স্নাতকসহ বিপিএড এবং ক্রাফট শিক্ষক ফাইন আর্টর্স স্নাতক ডিগ্রি। কিন্তু বাস্তবে ১৯৮৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত ক্রাফট ও শরীরচর্চার শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা যথাক্রমে এসএসসি ও এইচএসসি ডিগ্রি ছিল। এখানেই স্নাতক, এইচএসসি ও এসএসসি ডিগ্রিসম্পন্ন শিক্ষকগণ একই পদে মার্জ করেন। এর ফলে উচ্চতর ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি আবেদন করলে ডিজি প্রাথমিক শিক্ষা ১৪-০৫-১৯৮৭ তারিখ স্মারক নং ৪৯৭০ প্রাই (প্রশিক্ষণ) মূলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ করলে ২৯-০৮-১৯৮৮ তারিখ স্মারক-শাখা ৭/২-এ-১/৮৭/৯৩৬ শিক্ষা নং আদেশে নিম্নোক্ত নির্দেশ জারি করা হয়। "পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্নাতক ডিগ্রিধারী শিক্ষক/শিক্ষিকাদের বিএড পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার তারিখ হতে ইনস্ট্রাক্টরদের প্রযোজ্য স্কেলে (সংশোধিত নতুন জাতীয় বেতনক্রম ১৩৫০ থেকে ২৭৫০ টাকা) বেতন-ভাতাদি প্রদান করতে সম্মত হয়েছেন"। চিঠিটি স্বাক্ষর করেছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সহকারী সচিব আবু আলম মোঃ শহিদ খান। তিন বছর পর ২৯-০৪-১৯৯১ তারিখ তৎকালীন সিনিয়র সহকারী সচিব মোঃ মইনুল হোসেন স্বাক্ষরিত অন্য চিঠিতে ইনস্ট্রাক্টরদের প্রযোজ্য কথা বাদ দিয়ে হুবহু একই আদেশ জারি করেন। তোঘলোকি কাণ্ড আর কাকে বলে?

মনে রাখার বিষয় হচ্ছে, ২৯-০৮-১৯৮৮ তারিখের আদেশবলে উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক-ইনস্ট্রাক্টরদের বেতন-ভাতাদির স্বীকৃতির ফলে ক্রাফট শিক্ষকদের অবস্থা এক ধাপ নিচে থেকে যায়। অধিদপ্তরের রথী-মহারথী কর্মকর্তাদের বিশেষ আনুকূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক ১৬-০৫-৮৯ তারিখে দুটি আদেশ জারি করা হয়। স্মারক ৭এ/২০-পিই/পিটিসি/৮৩ প্রাই (প্রশিক্ষণ) নম্বর ১৯৮২তে দীর্ঘ 'বয়ান'শেষে ক্রাফট শিক্ষকদের বেতন ইনস্ট্রাক্টরদের সমান করা হয়। একই দিনে অন্য ইস্যুকৃত স্মারক নং ৭এ/২০-পিই(পিটিসি)/৮৩ প্রাই প্রশিক্ষণ নম্বর ১৯৮২তে দীর্ঘ 'বয়ান'শেষে ক্রাফট শিক্ষকদের বেতন ইনস্ট্রাক্টরদের সমান করা হয়। একই দিনে অপর স্মারক নং-৭এ/২০-পিই(পিটিসি)/৮৩ প্রাই প্রশিক্ষণ ১৯৯২তে "ক্রাফট শিক্ষক পদবি শ্রুতিমধুর নয়" বলে ইনস্ট্রাক্টর চারু ও কারুকলা পদবী প্রবর্তন করা হয়। একেই বলে বাংলাদেশী তোঘলোকি আমলাতন্ত্র! এর ফলে উচ্চ শিক্ষাগত এবং কম শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকরা একই পদবি ও একই বেতন-ভাতাদি পেতে বাধ্য হলেন। এ সুযোগ প্রদান করেই সহকারী সুপার পদে উন্নীত করার গেজেট জারি করা হয় (২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯)। এর ফলে এসএসসি ও এইচএসসি ডিগ্রিধারী শিক্ষকগণ সহকারী সুপার এবং